ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিটি প্লাটফর্মস ২০২১" শীর্ষক খসড়া নীতিমালার ওপর টিআইবির মতামত"

ধারা ১

(ক) অস্পষ্টতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র: খসড়া নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য - ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্লাটফর্মসমূহের কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করাই হবে খসড়া নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য।

আবার ধারা ১(৩) এ বলা হয়েছে যে, এটি মূলত "ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদানকারী" যারা অনলাইনে কনটেন্ট, সেবা, অথবা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট প্রদান করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অথচ খসড়া নীতিমালায় "ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদানকারী", "সেবা" অথবা "অ্যাপ্লিকেশন" এর মতো শব্দগুলোর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

ফলে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হবে।

এছাড়া, বিদেশি মালিকানাধীন বা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার বাইরে অবস্থানকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বা সহযোগিতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই, অথচ নীতিমালার প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে সমধর্মী বিদেশি প্লাটফর্মসমূহ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অর্ন্তভুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

ফলশ্রুতিতে নীতিমালাটির এই অস্পষ্টতা ও সর্বব্যাপী ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনায় দেশের বাইরের সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।

(খ) নীতিমালাটি কার্যকর হওয়ার সময়: ধারা ১(২) অনুযায়ী, "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) – এর ওয়েবসাইটে নীতিমালাটি যেদিন প্রকাশ করা হবে, সেদিন থেকেই এটি কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হবে।

প্রথমত: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ আইন) – এর ৯৯ ধারায় বলা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলে বিটিআরসি (১) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে এবং (২) প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

যেহেতু মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনায় খসড়া নীতিমালাটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই নীতিমালাটি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের অনুমতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: নীতিমালাটি কার্যকরভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত দুই বছর সময় দেওয়া উচিত। যাতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অভ্যন্তরিণ নীতিমালা, পরিচলনপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, নীতিমালাটির কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিটিআরসির অভ্যন্তরিণ প্রস্তুতি ও আধুনিকায়নের জন্যেও উল্লিখিত সময় জরুরি।

ধারা – ৩, ৪ ও ৫

(ক) সামঞ্জস্যহীন ও অসঙ্গতিপূর্ণ: ধারা ৩ – এ উদ্দেশ্য যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে ইন্টারনেট বা অনলাইন এর চাইতে প্রচলিত টেলিকমিউনিকেশন ও সম্প্রচারের বেশি মিল রয়েছে। অথচ, অনলাইনে যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে কনটেন্ট পরিবেশন করা হয়, তা কোনো অর্থেই প্রচলিত টেলিকমিউনিকেশন বা সম্প্রচার মাধ্যমের অনুরূপ নয়।

খসড়া নীতিমালার ধারা-৪ ও ৫ – এও এর প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা, ধারা দুইটিতে নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ ও নিবন্ধনের যে সব পূর্বশর্ত দেওয়া আছে, তা মূলত প্রচলতি টেলিকমিউনিকেশন সেবাপ্রদানকারী (ইন্টারনেট সেবাপ্রদানকারী ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধারা ৪, ৫, ৬.০২ ও ৭.০২

(ক) অপ্রয়োজনীয়/অবাঞ্ছিত নিবন্ধন শর্তাবলী: খসড়া নীতিমালায় ‘‘অনলাইন সেবাপ্রদানকারী’’ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ পাওয়ার জন্য যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা মূলত প্রচলিত টেলিকমিউনিকেশন মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা থেকেই করা হয়েছে। এমনটা দাবি করার কারণ:

প্রথমত: আবেদন করার ক্ষেত্রে ‘‘কর প্রদানকারী শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)’’, ‘‘ট্রেড লাইসেন্স’’ ও ‘‘মূল্য সংযোজন কর সনদ’’ থাকার শর্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, বিদেশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদ্ধতি বা নীতি অনুসৃত হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত: খসড়া প্রণয়নকারীরা বুঝতেই পারেননি যে, ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা দেওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থানের বাধ্যবাধকতার কোন যোগসূত্র নেই। বরং স্থানীয় অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত জনবল ও তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা ছাড়াই বিদ্যমান টেলিকমিউনিকেশন কাঠামো ব্যবহার করে কাঙ্খিত সেবা দেওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত: বিটিআরসিকে যেভাবে ‘‘নিবন্ধন সনদ’’ বাতিল, স্থগিত ও প্রত্যাহারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হবে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

চতুর্থত: ২০০১ আইনের ধারা ৬৪ এবং ৬৬এ (ধারা ১০ এবং ১২এ উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা আছে। যেখানে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তা অপরাধের সমানুপাতিক হওয়ার মূলনীতি উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে ২০০১ আইনের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ এবং পেনাল কোড-১৮৬০ এর মতো আইনের অধীনেও দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

পঞ্চমত: ২০০১ এর আইনের ৯৭এ ধারায় জাতীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে যে কোনো ব্যক্তিকে ‘‘আটক, রেকর্ড বা তথ্য সংগ্রহ" করতে, সরকার জাতীয় নিরাপত্তা, গোয়েন্দা এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করতে পরিষেবা প্রদানকারীদের বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, ২০০১ আইন অনুযায়ী বিটিআরসিকে পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার ব্যাপকতর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা কেবল সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলোকেই ক্ষুন্ন করবে না, বরং কোম্পানিগুলো যে দেশে অবস্থিত সেই দেশসমূহের বিদ্যমান আইন-নীতি এবং তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ভাঙতে বাধ্য করবে।

(খ) স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের ঝুঁকি: ধারা ৬ দশমকি ২ এবং ৭ দশমিক ২ অনুযায়ী, প্রত্যেক মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে জনবল নিয়োগ করতে হবে, যা বিদেশী পরিষেবা প্রদানকারীদের ওপর বাড়তি ব্যয় ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে। এছাড়া আবাসিক কর্মকর্তা এবং

প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে নীতিমালাটির নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ প্রয়োগের ঝুঁকি তৈরি করবে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে ২০০১ আইনের ৭৬ ধারা অনুযায়ী, নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী বলে গণ্য করা হয়, যা দেশের বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ধারা ৬.০১

(ক) কন্টেন্ট অপসারণসংক্রান্ত বিধানের ব্যাপক বিস্তৃত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণতা: ধারা ৬.০১ (ঘ) অনুসারে, বিটিআরসি বা আদালত দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা বা নিরাপত্তা, শালীনতা বা নৈতিকতা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, বা মানহানির মত কারণে কন্টেন্ট অপসারণের আদেশ জারি করতে পারবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টার মধ্যে নির্দেশিত কনটেন্ট অনলাইন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে,

প্রথমত: এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একই ধরণের অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭- ধারায় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অধীনে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিমত প্রকাশের জন্য অসংখ্য গ্রেপ্তারের ঘটনা দেখেছি।

দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, বিটিআরসি বা আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনটেন্ট অপসারণে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারীর অপরাগতা বা অসম্মতির মতো ঘটনা ঘটলে, যে হারে জরিমানার বিধান করা হয়েছে, তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য।

তৃতীয়ত: সাংবিধানিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, অনলাইন কন্টেন্টের নিয়ন্ত্রণ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা বাক্ ও মতপ্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের শামিল। তাছাড়া নির্দেশিত কনটেন্ট অপসারণের জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরিমানা ও শাস্তির এড়ানোর ভয়ে ‘‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’’ আরোপের পাশাপাশি অনেক যৌক্তিক কনটেন্ট পরিবেশন থেকেও বিরত রাখতে পারে। যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকে প্রকটতর করে তুলতে পারে।

চতুর্থত: প্রতিটি কনটেন্ট অপসারণের অনুরোধ অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। প্রসঙ্গত নিম্ন আদালতের রায়ের এমন অনেক নজির রয়েছে যার বিচারিক এবং প্রশাসনিক আদেশের যৌক্তিকতা উচ্চতর আদালত সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

ধারা ৭.০৩

(ক) মূল বার্তা প্রেরক সনাক্তকরণ ও সাংবিধানিক অধিকার: ধারা ৭.০৩ অনুযায়ী, বার্তা পরিষেবা প্রদানকারীকে আদালত বা বিটিআরসির নির্দেশে প্রত্যেক সেবাগ্রহণকারী বা ব্যবহারকারীকে যাতে শনাক্ত করা যায়, তার কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে বেশিরভাগ বার্তা পরিষেবা প্রদানকারী মাধ্যমসমূহ মূলত এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। কিন্তু আলোচ্য ধারাটি বলবৎ হলে বার্তা পরিষেবা প্রদানকারীকে এই এনক্রিপশন ব্যবস্থা ভাঙতে হবে। এতে করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার "ব্যক্তি গোপনীয়তা" সরাসরি লঙ্ঘিত হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ ও শিশু পর্নোগ্রাফি রোধে কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু তা কোনোভাবেই বিরুদ্ধ মতামত, কর্তৃপক্ষের সমালোচনা বন্ধ বা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ওপর নজরদারি করার ক্ষেত্রে বৈধতা প্রদান করে না।

ধারাটি বলবৎ থাকলে অনেক ব্যবহারকারীই নিরাপত্তা ও হেনস্তার শিকার হওয়ার ভয়ে ব্যক্তিগত মেসেজিং পরিষেবাগুলোতে নিজেদের ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে মেসেজিং সার্ভিসগুলো বাংলাদেশে তাদের সেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

ধারা ১০ ও ১২

(ক) শাস্তি ও সাংবিধানিক অধিকার: খসড়া বিধিমালায় উল্লিখিত শাস্তির বিধান (২০০১-এর আইন দ্বারা সমর্থিত) সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্বের ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। অপরাধের তুলনায় শাস্তির ধরন পর্যায়ক্রমিক ও সমানুপাতিক না হওয়ায় সংবিধানের ৩১ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটেছে। এছাড়া, ২০০১ আইনের ৭৭ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি।

(খ) সুরক্ষাবলয়ের অনুপস্থিতি: ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত কনটেন্ট শুধুমাত্র প্রচার ও প্রকাশে সহায়তা প্রদান করার কারণে মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের জন্য শাস্তির যে বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে ও তা থেকে নিস্কৃতি পেতে সুরক্ষাবলয়ের অনুপস্থিতি সংবিধান পরিপন্থি। ফলে মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান জরিমানা এড়াতে "আত্ম-নিয়ন্ত্রণের" জায়গা থেকে কনটেন্ট পরিবেশনে অতিরিক্ত মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করবে, এরফলে স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে অযাচিত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, যা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ধারা ৮ ও ৯

(ক) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা: খসড়া নীতিমালার তৃতীয়ভাগে, অনলাইন কিউরেটেড কন্টেন্ট, নিউজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কন্টেন্ট ও ওয়েবভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রন বা কর্তৃত্ব চর্চা করবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকায়, ভিডিও-অন-ডিমান্ড ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের সার্বক্ষণিক নজরদারি ও সেন্সরশিপ আরোপের ঝুঁকি রয়েছে।

(খ) এখতিয়ারসংক্রান্ত প্রশ্ন: আমরা লক্ষ করেছি যে, একই বিষয় নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয় এবং বিটিআরসি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করছে। বিটিআরসি আলোচ্য খসড়া নীতিমালাটি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় "ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা নীতিমালা-২০২১ (খসড়া) তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। একই বিষয়ের ওপর বিটিআরসি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে কেন নীতিমালা প্রণয়ন করছে তা কোনোভাবেই বোধগম্য হয়নি। দ্বিতীয়ত: একই ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সংস্থা প্রণীত নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা হবে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনাবলী উল্লেখ করা হয়নি। সর্বোপরি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়ের ইন্টারনেটভিত্তিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট আইনি সক্ষমতা আছে কী-না, সেটি একটি বড় প্রশ্ন।